Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates


# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য : গণমানুষের ছবি


| | |
|---|---|
| Volume | 47 |
| Issue | 3 |
| Year | 2006 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মো: নূরুল ইসলাম |
| Published online | June 1, 2006 |
| DOI | 10.62328/sp.v47i3.8 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.8 |
| Pages | ১৩৯-১৫১ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য : গণমানুষের ছবি

মো: নূরুল ইসলাম*

হাসান আজিজুল হকের গল্পে প্রথম থেকেই প্রাধান্য পেয়েছে সাধারণ মানুষ। এক অর্থে বলা যায় তারাই প্রধান। এই মানুষগুলো প্রধানত এসেছে উত্তর বঙ্গের নানা এলাকা থেকে। তবে কেবল সে কারণে তাঁর ওপর আঞ্চলিক অভিধা লাগানোর চেষ্টা করা ঠিক নয়। কেন না, তাঁর আবিষ্কৃত সাধারণ মানুষ আছে বাঙলার সব খানে : এবং তাদের অবস্থা কমবেশি একই রকম। হয়তো তারা কথা বলে তাদের স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষায়, এ টুকুই যা পার্থক্য। নচেৎ তারা সবাই একই ভাবে শোষণবাদী সমাজের হাতে বন্দী, নিরুপায় বন্দী। তিনি তাদের দুর্বিষহ জীবনের ছবি যেমন এঁকেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে, তেমনি তাদের শোষকদের ছবিও এঁকেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিন্তু পরম ঘৃণার সঙ্গে। একজন সমালোচকও বলেছেন সে কথা :

> উত্তর বাংলার গ্রামীণ জনপদের ভাঙন, সামাজিক শোষণ, কখনো প্রতিবাদ, বাঁচার সংগ্রাম— এই সব কথা নিয়ে হাসানের গল্পজগৎ। ...তিনি অবগাহন করেছেন রাঢ় বাংলার বৃহত্তর জনজীবনসাগরে, এবং সেখান থেকে তুলে এনেছেন বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী সুধা, দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সূর্যদীপ্ত বাণী। ...বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনা, কখনো-বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী।[১]

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' নামের প্রথম গল্পগ্রন্থে সংকলিত তাঁর সেই ১৯৬০ সালে লেখা শকুন গল্পটার কথাই ধরা যাক। ভর সন্ধ্যেয় একটি তেতুঁল গাছ পেছনে রেখে 'গোল হয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করছিল'[২] কয়েকটি ছেলে। এমন সময় :

> একটা আর্তনাদের মত শব্দে সবাই ফিরে তাকাল। তেতুঁলগাছের শুকনো ডাল মাড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে সোঁ-সোঁ শব্দে কিছু একটা উড়ে এলো ওদের মাথার ওপর দিয়ে। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে গভীর নিকষ একতাল সজীব অন্ধকারের মত প্রায়

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

> ওদের মাথা ছুঁয়ে সামনের পড়ো ভিটেটায় নামল সেটা। ... ওদের সর্দার ছেলেটি বুঝতে পারল, হামেশা দেখা যায় এমন পাখিদের মধ্যে শকুনই তীব্রবেগে মাটিতে নেমে তাল সামলানোর জন্যে খানিকটা দৌড়ে যায়। তাই তার চোখেই প্রথম পড়ল অন্ধকারের তালটা দৌড়তে দৌড়তে খানিকটা এগিয়ে বিব্রত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে গেল।[৩]

ছেলেরা বুঝতে পারলো ওটা একটি শকুন। তাদের কেউ বলে ওটা 'মোল্লা শিকুনি', কেউ বলে ওটা 'মোড়ল শিকুনি'। সে দিনের আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফিরে যেতে পারেনি। এখন রাতের আঁধারে কিছুই আর দেখছে না। ছেলেটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই :

> উগ্র একটা দুর্গন্ধ ওর নাকে এল। ভাগাড়ের আঁশটে গন্ধ। গলিত শবদেহের পচা পাঁকে সে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। শকুন কুকুরে লড়াইয়ের শেষ চিহ্ন এখনও একটা ছিটকে বেরিয়ে-আসা মোটা খসখসে নোংরা পালক থেকে টের পাওয়া যায়।[৪]

ছেলের দল ঠিক করলো তাকে নিয়ে মজা করবে। তাদের আক্রমণ ও হয়রানিতে পড়ে 'বুড়ো শকুন' বার বার চেষ্টা করলো পালিয়ে যেতে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই হলো ব্যর্থ রাতে চোখে কিছুই দেখতে পেলো না বলে :

> সামনেই একটা এঁদো ডোবা। মোড় ফিরেই মাটি ছাড়ল, উড়ল সে। কিন্তু বড় ইতস্তত, বড় অনিশ্চিত তার পক্ষসঞ্চালন। হয়ত হাঁফ ধরে গিয়েছে, ক্লান্ত হয়েছে সে। হয়ত দিকনির্ণয় করতে পারে নি। সে পড়ল ডোবাতে, পানি ছিটকে, নোংরা মোটা পানির ঢেউ তুলে যেসব ঢেউ আঁধারে চকচকে চোখে চেয়ে রইল, প্রায় শোনা যায় না এমন ভাবে আঘাত করল তীরে।
>
> একটি কদর্য জীব হিঁচড়ে উঠল ওপারে।
>
> পরিবর্তিত, ভিজে, ধুলোমাখা।[৫]

বলা বাহুল্য, বুড়ো শকুন এখানে শোষকের প্রতিনিধিত্ব করছে। ছেলেরা শোষিতের দল। শকুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে পাকড়াও করে ফেললো ছেলেগুলো। তাকে জাপটে ধরার পর তারা দেখলো 'হাঁপরের মত ফ্যাসফেসে শূন্য শব্দ উঠছে শকুনটার ভিতর থেকে। দীর্ঘশ্বাসের মত— ফাঁপা, শূন্য, ধরা-পড়ার।'[৬] শকুনটা দিলো এক সময় দ্বিতীয় দৌড়। তাতেও রেহাই পেলো না সে। ছেলেরা তাকে নিয়ে চললো টেনে। চেঁচাতে, চেঁচাতে। প্রশ্ন উঠলো, তাকে নিয়ে কেন এই খেলা, কি লাভ ? উত্তর হলো :

> 'লাভ, তোকে দেখে লোব— তু তো শকুনি, তোর গায়ে গন্ধ, তু ভাগাড়ে মরা গরু খাস, কুকুরের সাথে ছেঁড়াছিঁড়ি করিস— তোকে দেখে রাগ লাগে ক্যানে ?'

> ছেলেদের কথায় শকুনটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে, মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনের খাদ্য, তাদের পোষাক যেন ওর গায়ের গন্ধভরা নোংরা পালকের মত : সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। কেন মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে।
>
> সব শালোর হাঁফানির ব্যায়রাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শিকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম।[৭]

জানে বাঁচার জন্যে শকুনটা ছোটে আল টপকে, উঁচুনিচু জমি পেরিয়ে, নানা জাতের কাঁটা বনের ভেতর দিয়ে এবং আরও কাটাছেঁড়ার ভেতর দিয়ে। কিন্তু রেহাই মিললো না শেষ পর্যন্ত। ছেলেরা জোর করে তার ঠোঁট দুটো ফাঁক করে তার ভেতরে ভরে দিলো অনেকগুলো খড় ; তারপর ছিঁড়ে ফেললো তার পালকগুলো একের পর এক। শেষে তার চেহারা হলো 'কদাকার বড় মুরগির মত'। পর দিন দেখা গেল :

> ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে ... গত রাতের শকুনটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। কত বড় লাগছে তাকে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। ডানা কামড়ে, চিৎ হয়ে, পা দুটো ওপরের দিকে গুটিয়ে সে পড়ে আছে। দলে দলে আরও শকুন নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাংস খায় না। মরা শকুনটার পাশে পড়ে আছে অর্ধস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল।[৮]

সাধারণ মানুষের রক্তচোষাদের লেখক এ ভাবেই নিয়েছেন এক হাত ; ঐ দুরন্ত ছেলেগুলোর সাহায্যে। তারা ঐ নিকৃষ্ট শকুনেরই মতো ; এবং ঐ শকুনটির শেষ দশার মতোই হবে ওদের পরিণতি, ঐ রক্তশোষকদের, ঐ সুদখোরদের অর্থাৎ মোল্লা শিকুনিদের, মোড়ল শিকুনিদের, হামিদের বাপদের, অঘোর বোষ্টমদের। হাসান আজিজুল হকের হিসাবে ওরকম পরিণতিই নির্ধারিত হয়ে আছে ওদের জন্যে। এক জন সমালোচক তাই বলেছেন : "গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত 'শকুন' গল্পে সুদখোর মহাজন অঘোর বোষ্টমের কদর্য লোলুপ চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে শকুনটির মধ্য দিয়ে। ...গল্পটি অঘোর বোষ্টমের শোষণ ও সীমাহীন লোলুপতার ইতিবৃত্ত...।"[৯] একই কথা বলেছেন আরও এক জন সমালোচক :

> সুদখোর শোষকেরা আমাদের সমাজে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। শকুন যেমন মৃত প্রাণীর মাংসে জীবন-ধারণ করে থাকে, আমাদের সমাজেও তেমনি নিষ্ঠুর ধনিক শ্রেণি মৃতপ্রায়, অসহায়, দুঃস্থ মানুষের উপর তাদের নগ্ন থাবা প্রসারিত করে থাকে।[১০]

এ প্রসঙ্গে এক জন সমালোচক বলেছেন :

> অত্যাচারী হামবু-র জনক ও সুদখোর মহাজনের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করেই তারা চরম প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই শকুনটার শরীর থেকে একটি একটি করে

> সমুদয় পালক খসিয়ে নিয়েছে। শোষক-বুদ্ধিজীবীদেরকে যে শকুনের মতো মনে করা হয় তা তারা ঘরে-বাইরের প্রতিবেশ থেকেই জেনেছে। তাই শোষণলিপ্সু বুদ্ধিজীবীদের প্রতীক ঐ শকুনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে তাদের এতো উল্লাস![১১]

অবশ্য, সুদখোর, গরিবের রক্তখোরদের সঙ্গে একাট্টা হিসেবেই যে গল্পকার বুদ্ধিজীবীদের এ গল্পে সরাসরি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এমনটি মনে হয় না। এ বাদে সমালোচকের বক্তব্য যথাযথ বলে মান্য করা চলে।

কোন এক ভামিনী ও তুষ্টোর ছবি আছে 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্পে। 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীরা কি ভাবে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমনকি উচ্চ বর্ণের হিন্দুর দ্বারা। এ ক্ষেত্রে অবশ্য হিন্দুর বর্ণভেদের পাশাপাশি আর্থিক যোগ্যতার মাপকাঠিটাও তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে আবার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, এক জন লম্পটের অকাট্য যুক্তি হিসেবে, উচ্চ বর্ণের সতীনাথের স্ত্রীর ঝরে পড়া যৌবনের কথাটিও : 'চামড়া-ঝোলা স্থূল কমলির মা'। স্বামীর জ্ঞাতসারে, তার চোখের সামনে ব্যবহৃত হয় তুষ্টোর স্ত্রী। অথচ, তার কিছুই বলার থাকে না। সমাজ ও ধর্ম এমন ভাবে জাল বিস্তার করেছে যে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যেন একেবারেই অসম্ভব। নীচু জাতের মেয়েরা হবে উঁচু জাতের, পয়সাওয়ালাদের লালসার শিকার, এমন ব্যবস্থাপত্রই যেন কার্যকর সেই প্রাচীন কাল থেকে। এই ব্যবস্থাপত্রের জোরেই মুদি দোকানের মালিক সতীনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত বাঁধা মেয়েলোক হিসেবে রেখে দিয়েছে ভামিনীকে তাদের গ্রামেরই এক প্রান্তে। পাকা ব্যবস্থা। 'সতীনাথ বানিয়ে দিয়েছে এই ঘর। সে টেনে এনেছে তাকে স্বামীর কাছ থেকে। তাকে শায়াটা শাড়িটা তেল নুন দেয়'[১২]। ব্যবস্থাটি এমনই স্বাভাবিক যে, যখন সতীনাথ তাকে জিজ্ঞেস করে :

> সত্যি করে বল তো ভামিনী, তোর আর ভালো লাগে না, নয়?
>
> মেয়েলোকটা উত্তর দেয় না, অন্যদিকে চেয়ে একসময় আস্তে আস্তে বলে, ভাল না লাগলে চলবে ক্যানে কত্তা? আপনি পুষছ যে আমাকে। ভাত কাপড় দিছ যে! সোয়ামি লিতে এলে যেতে পারি না, ঘর তুলে দিলে না আপুনি?[১৩]

স্বামী তার ভাতের জোগাড় করতে পারে না, কাপড় দিতে পারে না ; কেবল ভাতকাপড়ের জন্যেই তাকে বেশ্যাবৃত্তি করতে হয়। সমাজে এমন কেউ নেই যে, তাদের দুমুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা করে। সরকার তো করেই না। সমাজ বা সরকার তাদের কাজও দেয় না। প্রতি রাতেই ভামিনীর স্বামী তুষ্টু আসে তাকে নিতে। কিন্তু কোন সময়ই সে বলে না যে, তার কাছে ফিরে গেলে মিলবে ভাত ও কাপড়। সে কারণে, সতীনাথের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে ভামিনী যেতেও পারে না তার স্বামীর ঘরে। সে জানায় সতীনাথকে : 'আপুনি ঘুমুলে পেত্যেক রাতে আসে। আমি খেদিয়ে দি। মদ

খেয়ে মাতাল হয়ে আসে। তারপর লড়বড় করে চলে যায়'[১৪]। একদিন তুষ্টু এসে হৈচৈ বাধিয়ে দেয় : 'হেইরে তু বাড়ি চ। তোর সুয়ামি আমি। তোরে ঘরে লোব'[১৫]! ঘরের ভেতর তখন সতীনাথ কিছুটা ভয়ই পায়। তাই সে বেরিয়ে পড়ে বাইরে :

> সতীনাথকে দেখে যেন খুব অপ্রতিভ হয়েছে এমনি ভাব করে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তুষ্টু বলে, এই যে বাবু আপুনি এইখানে আছেন আমি বুঝি নাই গো। নাক মুলছি কান মুলছি, আপনি থাকলে আমি আসি? না, তা হয় বাবু? আমি মাগিটাকে ঘরে যেতে বললাম তা আপুনি আছেন আমি জানি নাই। ... আমি ঘাট করলাম, দোষ করলাম? পাঁচটা লোক বলুক, আমি সাত জুতো খাব।[১৬]

এরপরও সতীনাথরাও জানে, তুষ্টুরাও জানে, এই অবস্থা চলে আসছে এবং চলতেই থাকবে। উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর সম্পদ ও সম্ভ্রম শোষণ ও ভোগ করবে, সমাজটা এভাবেই সাজানো আছে যেন সেই প্রাচীন কাল থেকেই। সপ্তম শতকের এক জন চর্যাপদকর্তা বলেছিলেন :

> নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
>
> ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ ॥[১৭]

বলা বাহুল্য, সে সময়ও অন্ত্যজ শ্রেণীর অস্পৃশ্য ডোম নারীরা থাকতো নগরের বাইরে ; কিন্তু তাদের ভোগ করতো নেড়ে বামুনেরা। এ যেন ছিল এক প্রবহমান সামাজিক চুক্তি। সে চুক্তি কম বেশি আজও অব্যাহত। তখনকার বামুনেরা থাকতো নগরে এবং ডোম্বীরা থাকতো নগরের বাইরে। তারা শহরে আসতো জীবিকার সন্ধানে এবং শিকারে পরিণত হতো শহুরে বামুনদের। ভারতের বহু জায়গায় আজও অন্ত্যজ শ্রেণী তথা অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষেরা প্রত্যহ নিপীড়িত হয় উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা, তাদের নারীরা ভোগের সামগ্রী হয় ব্রাহ্মণদের। রাতে তারা এলে অন্ত্যজদের স্বামীরা স্ত্রীদের ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এর অন্যথা হলে হত্যা ও নির্যাতন নেমে আসে তাদের ওপর। বর্তমানে এ ধরনের শোষণ ও অবমাননা কিছুটা কমে গেলেও এটি একেবারে বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশে বর্ণভিত্তিক শোষণ ও অবমাননা ঐ পর্যায়ে না থাকলেও গরিবদের অবস্থা অন্ত্যজদের চাইতে উন্নত কিছু নয়।

'মন তাঁর শঙ্খিনী' গল্পটি নয় প্রত্যক্ষ কোন শ্রেণী শোষণের। কিন্তু তার মূল বিষয়টি যে শোষণভিত্তিক সমাজজাত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হামিদা ও শাদু পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের বিয়ে হয় নি শাদুর আর্থিক অক্ষমতার কারণে। ফলে, 'হামিদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ট্যারার সঙ্গে। তার বাড়ি অন্য গ্রামে। লোকটা ট্যারা, মিশমিশে কালো, ঘাড়ে-গর্দানে।'[১৮] হামিদা সুখী হয় নি এ বিয়েতে, সে জন্যে নানা টাল বাহানায় থেকে গেছে বাপের বাড়িতেই। তাদের দু জনের অর্থাৎ হামিদা ও

শাদুর দেখাসাক্ষাৎ, মেলামেশা চলছে ; কিন্তু গোল বাধে যখন শাদু তাকে বিয়ে কবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে। সে বোঝে না যে, সেটি হওয়ার নয়। সরল মোটা বুদ্ধির শাদু নিজেকে নিয়ে, হামিদা ওরফে হামিকে নিয়ে পড়ে মহা বিপদে :

> ক্যানে সে আমাকে বলেছিল ভালোবাসি— তা লইলে তো এ্যামোন হতো না। আমাকে বললো ভালোবাসি, কতদিন ডাকলে অর ঘরে, তা বাদ আবার বিয়ে করলে। বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গেল না। তাই যা, শ্বশুরবাড়ি যা। তু শ্বশুরবাড়িও যাবি না, আমার ঘরেও আসবি না, তোকে লিয়ে তো ভারি বেপদ হলো।[১৯]

শাদু ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না, কেবল এ কারণেই হামিদা তাকে বিয়ে করেনি। পরে সে বুঝতে পারে তার ভুল হয়ে গেছে। পেছন ফেরার সুযোগ নেই জেনে সে দুলতে থাকে দোটানায়। স্বামীর বাড়ি যায় না এবং শাদুর সঙ্গে মেলামেশা রাখে অব্যাহত। এই অনৈতিক সম্পর্কটি পছন্দ নয় শাদুর। গরিব হলেও নৈতিকতার চেতনা তার কারও চেয়ে কম নয়। এক পর্যায়ে সে বলে হামিকে : 'ভালো না বাসলে স্বামীর কোন মর্যাদা দেবার দরকার নেই।' উত্তরে হামি বলে : 'ছি, উ কথা বলিস না। সোয়ামি সব সোমায়েই সোয়ামি।'[২০] হামি এক সময় বুঝতে পারে, এ ধরনের বিপজ্জনক সম্পর্ক বেশি দিন বয়ে বেড়ানো যায় না। এক রাতে তাই শাদু ধরা পড়ে যায় ট্যারা ও তার দুই সঙ্গীর হাতে। হামির অভিযোগ, শাদু রাতে তার শাড়ি ধরে টেনেছিল। ট্যারা জানায়, শাদু যে সে রাতে আসবে হামির কাছে তার 'সব্বোনাশ' করতে, এ কথা আগেই তাকে জানিয়েছিল হামি। যে শাদু দৈহিক শক্তিতে অজেয়, কুস্তিতে কোমর ভেঙে দিয়েছে রহম আলির, সেই শাদুই ঝিম মেরে যায় হামির বিশ্বাসঘাতকতায়। অভিযোগ স্বীকার করে শাদু। গ্রাম্য শালিসে তার পাওনা হয় দশ জুতো খাওয়া। বস্তুত, হামির আচরণগুলোর মাজেজা কখনও বুঝতে পারে নি শাদু। কেনই বা ভালাবাসা, কেনই বা তাকে বিয়ে না করা, কেনই বা স্বামীর কাছে না যাওয়া, কেনই বা তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করা, কেনই বা রাতে আসতে বলে শালিসে তাকে সোপর্দ করা এবং দশ জুতো খাওয়ানো। তাদের শেষ দেখাটা আলাপটা হয় নিম্নরূপে:

> আমি দশের কাছে দশ জুতো খ্যালোম— অন্ধকারে অশথ গাছটার মোটা গুঁড়িটায় বসে শাদু ভাবে, উ কি ভালবাসতে আচে, উ পাপ, উ কি কেউ ভালোবাসে? উ যি শাপ !
>
> ওর পিছনে একটি ছায়া এসে দাঁড়ায়।
>
> শাদু বিড় বিড় করে, আমার লেজ্য বিচার হলচে। দশের কাছে আমি দশজুতো খ্যালোম। আমার জানটা লিয়ে লিলে না ক্যানে অরা।
>
> পিছনের ছায়া মৃদুকণ্ঠে ডাকে, এ্যাই !

শাদু পিছন ফিরে তাকায়। হামিদা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার কাপড় তোলা, জড়সড় হয়ে নববধূর মতো দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো হাসছে।

এ্যই শুনতে পেচিস না?

শাদু চুপ করে থাকে।

আর ভালোবাসবি না? মন জুড়ুইতে যাবি না আমার কাচে, শেতল হবি না? ম্লান হাসে হামিদা।

শাদু কথা বলে না।

আমার সাথে কতা বলবি না, লয়?

মানুষটা তবু কথা বলে না।

বলিস না, বলিস না, কতা বলিস না। যমের অরুচি, চক্ষের শূল— হু হু করে কেঁদে ভেঙে পড়ে মেয়েটা। ঐ যে ওর ভালোবাসাটা ওর চোখ আশ্রয় করে আছে— যেন চোখে দেখা যায়।

আজ যেসি আমি সোয়ামির বাড়ি, তোর ছেলে রইল আমার প্যাটে। খানিকটা শোধ দেলোম।

যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।[২১]

বলা বাহুল্য, হামির এই শেষ আচরণটি আত্মপীড়নও বটে, সুচিন্তিত কৌশলও বটে। শাদুকে প্রকাশ্যে বেইজ্জত করে সে বাঁচিয়েছে নিজের ইজ্জত স্বামীর কাছে, সে বাঁচিয়েছে শাদুর জন্যে তার ভালোবাসা, সে মর্যাদাসহ বাঁচিয়েছে তাদের প্রেমের ফসল অনাগত সন্তানকে। হয়তো এ ছাড়া তার অন্য কোন উপায়ও ছিল না। শাদুকে সে জুতো খাইয়েছে। কিন্তু আসলে সে জুতো মেরেছে সেই সমাজকে যে সমাজে শাদু ও হামির প্রেম খুঁজে পায় না কোন পথ । অর্থনৈতিক বৈষম্যপীড়িত সমাজে শাদুরা জুতো খায়, আর হামিরা ঘর করতে বাধ্য হয় সেই স্বামীর যার টাকা আছে, কিন্তু যাকে সে ভালোবাসে না।

এ গ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'উত্তর বসন্তে' আঁকা হয়েছে একটি দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত বা বলা যায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি। পঞ্চম গল্প 'বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর' ধারণ করেছে প্রায় একই রকম চিত্র। সপ্তম গল্প 'সীমানা'ও তা-ই। এবং অষ্টম গল্প 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী' ও নবম গল্প 'আবর্তের সম্মুখে' তো বটেই। এ গুলোতে উঠে এসেছে ঐ শ্রেণীর আর্থিক সংকট, বেকারত্বজনিত সংকট, কারও সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ঘর বাঁধার ক্ষেত্রে প্রায় অপ্রতিরোধ্য অন্তরায়জনিত সংকট, যৌনচেতনার সাবলীল বিকাশের সঙ্গে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দ্বন্দ্বজাত সংকট। এ গুলো আলাদা একটি বিষয় এবং অনেকের আলোচনায় তা উপস্থাপিতও হয়েছে।

দ্বিতীয় গল্প 'তৃষ্ণা' শুরুই হয়েছে লম্বা ঢ্যাঙা বাশেদের খাই খাই ভাবের কথা নিয়ে। শৈশবে সে ছিল এক রকম। কিন্তু

> 'এরই ফাঁকে সে অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হয়ে উঠতে শুরু করল। গাঁয়ের মানুষেরা বিস্মিতভাবে চেয়ে চেয়ে ওর বেড়ে ওঠা দেখে। ...এরপর যেদিন গাঁয়ের সব চাইতে লম্বা মানুষটা বাশেদের কাঁধের নিচে পড়ল সেদিনই সে সকলের থেকে আলাদা হয়ে গেল।'[২২]

দেহটা তার দীর্ঘ, খাওয়াটাও তার জবরদস্ত, যেন সে জন্মেছে কেবল খাওয়ারই জন্যে :

> সে দগ্‌দগে ঝালের মাছ খায়, তর্ক করে আড়াই সের রসগোল্লা গেলে, পেটপুরে বেগুনি খায় আর হাড়গিলের মত ঢ্যাঙা হতে থাকে। বন্ধুদের বলে, কি ভালো যে লাগে খেতে ! পোত্যেক দিন সকালে উঠেই মনে হয়, শালা বেঁচে তো আছি খাবার লেগে।[২৩]

বাশেদের জন্যে তার মায়ের মহা দুশ্চিন্তা। কি ভাবে ছেলেটা ভাত পাবে, বেঁচে থাকবে? মা তা অন্ধকারে একা বিড়বিড় করে :

> আঃ, ছেলেটা ই সংসারে অতিথ গো ! ইয়া আল্লা, কত গোনা করলাম আল্লা ! মিনষেটা ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার সব্বোনাশ করলে। আমি ছাড়া বাছেদের আর ক্যা আচে? ই সংসারে উ ভাত ক্যানে পাবে? বাচেদের বাপ তো বাচেদের বাপ লয় ! ইয়া আল্লা, আমি বুঝতে পারি নাই। সেই মিনষেটার সাজা দিও, ই বান্দার গোনা লিও না।[২৪]

বেঢপ লম্বা হওয়ার কারণে সে যে পৃথিবীতে একা তা এক সময় বুঝতে পারে বাশেদ। এটি তার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তার আচরণে দেখা দেয় কিছুটা অস্বাভাবিকতা।

> 'আলো- আঁধারিতে রাস্তার মোড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বয়স্ক লোকেরাও আঁতকে উঠত ওকে দেখে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো দিনের বেলাতেই ওকে দেখলে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরত। বাইরের গ্রামের লোক এই অবস্থায় তাকে দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পিছন ফিরে নিস্তব্ধ অন্ধকারে অন্য কোন রাস্তা ধরে আত্মীয় বাড়িতে এসে বলে, ভূত দ্যাখলাম বাপু বর্গীতলায়।[২৫]

এ হেন বাশেদকে এক দিন সাপে কাটলো। সেটি বিষাক্ত না হওয়ায় তার পা ফুলে ঢোল হলো, কিন্তু সে বেঁচে গেল। কিন্তু

> কিছুদিন পরেই বাশেদের ফরশা চামড়ার ওপর কালো কালো দাগ পড়ে গেল। পাঁজরের আর বুকের হাড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল আর কপালের ভিতর তার গোল চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত হয়ে উঠল।
>
> সে যে কেমন হয়ে উঠছে কেউ তার বর্ণনা দিতে পারছে না।[২৬]

এর কিছুদিন পর বাশেদকে দেখা গেল এক পয়সাওয়ালার আয়োজিত ওরশের খানা খেতে। 'খেতে খেতে বাশেদের চোখ বড় হয়ে উঠল, একবার ভাত গলায় আটকে গিয়ে মনে হলো, ওর চোখ দুটো বোধহয় বেরিয়ে আসবে'।[২৭] একজন তো বলেই বসলো, সে 'মরণ খাওয়া' খাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে খাওয়ার ফলে বিরাট সমস্যায় পড়ে গেল বাশেদ। সে আর উঠতেই পারলো না তার জায়গা থেকে। 'বাশেদ ভাবল, খোদা, তাইলে কি আর আমি উঠতে পারব না? আজ রেতেই কি মরব এই আঁদারের মদ্যি'?[২৮] রাত নেমে এলো এবং শোনা গেলো দূরের ঝোপের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে।

> হঠাৎ রিন্‌রিন্ করে যেন একটি মেয়েই হেসে উঠল। কান খাড়া করল বাশেদ। ফিস্‌ফিস্ করে কে বলল, এ্যাই সখি, হাসিস না, লোক জানতে পারবে
>
> পারুকগো, পয়সা বার কর।
>
> না,আগে—
>
> উঁহু, আগে পয়সা বার কর, তা পর কথা।
>
> আবার রিন্‌রিন্ করে হেসে উঠল মেয়ে, দুআনা লয়, দুআনা লয়, তিন আনা
>
> করে দিতে হবে।
>
> ইঃ, ভারি লাটসাহেব? তিন আনা লাফাইচে।
>
> তবে চললোম।
>
> মেয়েটি বোধ হয় উঠল, ছেলেটি মিনতি করে ওঠে, ঠিক আছে যা, যাস না,
>
> এই লে তিন আনা।
>
> কই, তু দে।
>
> দিচি— বাশেদ চিনতে পারল এ গলাটা গাঁয়ের যিনি মাথা তাঁর বখাটে ছেলে সোহরাবের।[২৯]

এর পরপরই বাশেদের মধ্যে জেগে উঠলো সেই আদিম প্রবৃত্তি যা থেকে মুক্তি নেই কোন নরনারীর।

> আগুন হয়ে উঠল যেন রক্ত। ওদিকটা একেবারে চুপ। অন্ধকার কাঁপছে। ঠক ঠক করে শুকনো পাতা খসে পড়ল। দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ। বাশেদ তার বিরাট ভূতুড়ে কঙ্কালটা নিয়ে প্রাণপণে ওঠবার চেষ্টা করে। এলোমেলো হাত দিয়ে অনুভব করে লুঙির একটা খুঁটে বাঁধা আছে পয়সা। চার আনা পয়সা।...
>
> ...আমি কবরে যাব না, আমি মরব না, আমি উই ঝোপটার কাছে যাব, সিকিটো ছুঁড়ে দোব সখির আঁচলে, এই লে, আমি বাচেদ— আমি— [৩০]

তার পর, বলা বাহুল্য, তীব্র প্রবৃত্তিতাড়িত

> বাশেদ প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। ...উঁচু নিচু মাটিতে তার পা কাঁপতে লাগল ... বিশাল তালগাছের মত বাশেদ মাটিতে পড়ল আর গড়িয়ে চলল ঢালু পাড় বেয়ে কিংবা বলা যায়, একটা তীক্ষ্ণ তীব্র মৃত্যুর মত অমোঘ প্রবৃত্তি গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চলল ঢালু পাড় বেয়ে, তার মৃত্যুর দিকে।[৩১]

আর সঙ্গে সঙ্গে 'ভয়ঙ্কর চিৎকার করে' ঝোপের আড়াল থেকে পালিয়ে গেল 'তিনটি চলন্ত অন্ধকার'। পর দিন সকালে দেখা গেল, বাশেদের 'উলঙ্গ, বিবর্ণ, নোংরা মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে' ঢালের নিচে জমির এক কোণায়। এ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে অঙ্কিত আদিম প্রবৃত্তির খেলা দেখানো হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে শোষিত, দরিদ্র মানুষের যে করুণ ছবি আঁকা হয়েছে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। এক মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা নেই যে মানুষগুলোর তাদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেবে কে? মাত্র তিন আনায় দেহ ভাড়া খাটাতে হয় যে নারীর তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কি স্বীকার করে আমাদের এই সমাজ? এই কুৎসিত শোষণ যেন সেই আদি কাল থেকে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। হতদরিদ্র জানে, তাকে মরতে হবে ভাতের অভাবে, তাকে বেচতে হবে শরীর এক মুঠো ভাতের জন্যে। তার যৌনচেতনা পায় না স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার কোন সুযোগ সে ঐ অব্যাহত শ্রেণীশোষণেরই কারণে।

একই কথা বলেছেন এক জন বিশিষ্ট সমালোচকও :

> ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক হিসেবে অবধারিতভাবেই বাশেদকে জারজ সন্তানরূপেই অবতীর্ণ হতে হয়। প্রবল কামুকতা ও মাত্রাহীন পেটুকতার অতৃপ্ত জ্বালায় সর্বদাই তার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। ...সে পেট পুরে কোনোদিন আহার করার সুযোগ লাভ করেনি— তাই সে স্বপ্ন দেখে তার চারপাশে সর্বদাই যেন ভূরি ভোজনের আয়োজন চলছে। বাশেদ শুধু পেটের ক্ষুধায় যন্ত্রণাকাতর হয় না, সে যৌনক্ষুধায়ও দারুণভাবে ছটফট করে। ...সামাজিক জীবনে তার কোনো আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদা নেই। তাই অস্বাভাবিক পথ ধরেই বাশেদ তার যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য দুর্দমনীয় এক আবেগে ফেটে পড়ে। ...সঙ্গমের বাসনা চরিতার্থ হবার আগেই ঢ্যাঙ্গা বাশেদ, এবং বাশেদ মারা যায়।
>
> দারুণ অবক্ষয়ের সন্তান ঐ ঢ্যাঙ্গা বাশেদ— তার জীবনের সমুদয় আচরণ ও স্বভাব সে কারণেই বিকৃত, ধিক্কৃত ও নিন্দিত।[৩২]

একেবারে শেষ গল্প 'গুনিন' গড়ে উঠেছে গাঁয়ের অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ভূতপ্রেতে বিশ্বাসের ওপর। 'সাড়ে ছফুট লম্বা, জীর্ণ কঙ্কালসার একটি মানুষ, দুচোখ

যেন জ্বলছে, হাতে ছোট একটি লাঠি, বিড়বিড় করে কি বলছে সে। . . ঝাড়ফুঁক বা এ ধরনের বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে ওর সামনে কেউ যায় না'।[৩৩] মরণকালে তার তিন নাতি রহম, রমিজ ও আলীকে সে বলে :

> আমারে তোরা তোগো দাদা বলে জানো, কিন্তু আমি কারো কেউ না, আমি রজব আলী গুনিন, আমি কহন হইছি কেউ জানে না, কিন্তু মরণডা আইজ হইবে। মুই আছিলাম ভূত পেত্নীর রাজা, হকলডি মোরে মানে। কিন্তু সাবধান, একজন তোগো ক্ষতি করবে, মোর জীবন কালে পারে নাই, এ্যাহন আমি মরমু, এ্যাহন হে তোগো খুন করবে। ...কিন্তু ডর নাই তোগো। একটা মন্তর শিখাইয়া দিমু। ঐ হারামজাদা তোগো কিছু করতে পারবে না, যা চাও— ধন দৌলত, মাইয়ালোক, যা চাও সব পাবি। কিন্তু মন্তর তিনোজন শিখতে পারবি না। যে কোন একজনের শিখতে হইবে। কেডা শিখবি ক।[৩৪]

ধূর্ত গুনিনের পাল্লায় পড়ে মুহূর্তের মধ্যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে রমিজ ও আলী। রহম প্রথমে দেখতে থাকে তাদের মরণপণ সংগ্রাম। এক সময় সুযোগ বুঝে ক্লান্ত দুজনেরই ঘাড় চেপে ধরে মাটিতে, তারপর তারা মারা গেছে মনে করে বেরিয়ে যায়। অবশ্য, লড়াইকালে রমিজের এক লাথি খেয়ে মারা পড়ে গুনিন। পরদিন বেলা দশটার দিকে চেতনা ফিরে পায় রমিজ ও আলী। 'তারপর ঝগড়াটা আপসে মীমাংসা করে নিয়ে ওরা গ্রামবাসীদের লোমহর্ষক গল্প বলতে থাকে।'[৩৫] গুনিন, আলীর বেহাল অবস্থা ও রমিজের গলায় বসে যাওয়া দশ আঙুলের ছাপ সম্পর্কে নানা ভীতিকর সব গল্প। এ সব গল্প সৃষ্টি করলো একটি আতঙ্ক যা তাড়া করে ফিরতে থাকলো গ্রামবাসীদের। এরই সঙ্গে যুক্ত হলো আমেনা চাচীর মেয়ে রাবেয়াকে লাভ করার লড়াই। রমিজ ও আলী দু পক্ষ। আলীর অবস্থা ভালো, চাচীও নিমরাজি। কিন্তু রমিজ ছাড়ার পাত্র নয়। কারণ, সে আগেই জয় করেছে রাবেয়ার হৃদয়। তরপরও চাচী মেয়ের বিয়ে ঠিক করে আলীর সঙ্গে। এমনি এক পরিস্থিতিতে, বিয়ের দু তিন দিন বাকি থাকতে আপাত নির্বিকার রমিজ সন্ধ্যার একটু পরে আলীকে জমির আল বাঁধার কাজে ডেকে নিয়ে গেল। রাত দশটার দিকে এক ভয়াবহ চিৎকারে গ্রামবাসী সচকিত হয়ে ওঠে। ওরা মনে করে, হয়তো গুনিনই কোন অঘটন ঘটাতে উঠে এসেছে কবর থেকে। সবাই মিলে লণ্ঠন হাতে এসে দেখে 'আলীর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা।' আল বাঁধার কোন কাজই হয় নি। ফলে, প্রথমেই ধরে নেওয়া হলো যে, 'গুনিনের জেন'ই ঘটিয়েছে ঐ অঘটন। কোবাদ একবার তার সন্দেহের তীর রমিজের দিকে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু কুসংস্কারকে বিশ্বাস করার আগ্রহ সবার এতো বেশি যে, তার ঐ ইঙ্গিত ধোপেই টিকলো না। রমিজ কৌশলে সবটা চাপিয়ে দিলো মৃত গুনিনের ওপর। তার সুন্দর করে বোনা গল্পই বিশ্বাস্য মনে হলো সবার। কিছুদিন পরই সে বিয়ে করে ঘরে তুললো

রাবেয়াকে। এবং সবটাই সম্ভব হলো শিক্ষাবঞ্চিত মানুষগুলোর ভূতপ্রেত, দত্যিদানা, জ্বিনপরীতে অন্ধ বিশ্বাসের কারণে। এখানে নেই প্রত্যক্ষ শ্রেণীশোষণের কোন নগ্ন চিত্র; কিন্তু আছে শোষণ ও বঞ্চনাজাত সাধারণ মানুষের অনিবার্য অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের এক ছবি।

হাসান আজিজুল হক আলোচ্য গল্পগ্রন্থে ও পরবর্তী গল্পগ্রন্থগুলোতে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চিরশোষিত দরিদ্র মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন। এক জন সমালোচক বলেছেন : 'সমাজ জীবনের হতাশা, অবক্ষয় ও দারিদ্র্যের ছবি তিনি অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন'।[৩৬] অপর এক সমালোচক বলেছেন :

> হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর ইতহাস রূপলাভ করেছে। একদিকে আছে তাঁর এই জীবন-রূপায়ণের ভয়ঙ্কর বাস্তব-প্রবণতা, অন্যদিকে আছে এই রূপায়ণের তাঁর আপন পদ্ধতি। ...তিনি জীবনবাদী, সমাজ ও আদর্শ-সচেতন গল্পকার। অনেক গল্পেই তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন, গণমানুষের সংগ্রামের অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বাস রেখেছেন।[৩৭]

বস্তুত, যথার্থই তিনি কেবল হতাশার ছবি এঁকেই তাঁর দায় শোধ করেন নি, একই সঙ্গে তিনি বলেছেন মানুষের অব্যাহত সংগ্রামেরও কথা, যে কোন অবস্থায় টিকে থাকার কথা। এ প্রসঙ্গে এক জন সমালোচকের নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

> নিরন্ন মানুষগুলো যে পুতুলের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে বার বার, হচ্ছে শোষিত ও প্রতারিত এবং সেই প্রতারণার জালটি যে তারা সয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু তারা পারছে না তার উৎস উপড়ে ফেলতে — এটি স্পষ্ট তাঁর লেখায়। শোষিত মানুষগুলোর জীবনের ছিন্ন অবস্থা তিনি স্পষ্ট ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ... তিনি কথা বলেছেন তাদের একজন হয়ে। তাঁর গল্পগুলো পড়লে বোঝা যায় কি ধূসর হয়ে পড়ে আছে সমগ্র বাংলাদেশ ...। কিন্তু সেই বিবর্ণতার মধ্যে যেটি দীপ্যমান হয়ে উঠেছে সেটি এই যে, এই সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এ দেশের মানুষ টিকে আছে, টিকে থাকবে।[৩৮]

**তথ্যপঞ্জি**

---

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, ঢাকা, ২০০২, পৃ ১৮৬-৮৭
. হাসান আজিজুল হক রচনা সংগ্রহ - ১, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১৩
৩. ঐ, পৃ ঐ
৪. ঐ, পৃ ১৪
৫. ঐ, পৃ ১৫

৬. ঐ, পৃ ১৬
৭. ঐ, পৃ ১৭-১৮
৮. ঐ, পৃ ২১
৯. চঞ্চল কুমার বোস, বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ ১৮২
১০. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প, জীবন ও সমাজ, ঢাকা, ১৯৯৭,ঐ, পৃ ৫৬
১১. আবু জাফর, হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ৩০
১২. হাসান আজিজুল হক রচনা সংগ্রহ - ১, পূর্বোক্ত, পৃ ৪০
১৩. ঐ, পৃ ৪২
১৪. ঐ, পৃ ৪২
১৫. ঐ, পৃ ৪২
১৬. ঐ, পৃ ৪২-৪৩
১৭. Muhammad Shahidullah, Buddhist Mystic Songs, Text 10, কৃষ্ণপাদানাম্, Dhaka, Revised & Enlarged Edition, 1966, p. 30
১৮. হাসান আজিজুল হক রচনা সংগ্রহ - ১, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭
১৯. ঐ, পৃ ৭৮
২০. ঐ, পৃ ৮০
২১. ঐ, পৃ ৮৩-৮৪
২২. ঐ, পৃ ২৩
২৩. ঐ, পৃ ২৩
২৪. ঐ, পৃ ২৪
২৫. ঐ, পৃ ২৪
২৬. ঐ, পৃ ২৪
২৭. ঐ, পৃ ৩০
২৮. ঐ, পৃ ৩০
২৯. ঐ, পৃ ৩১
৩০. ঐ, পৃ ৩১
৩১. ঐ, পৃ ৩১
৩২. আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১
৩৩. হাসান আজিজুল হক রচনা সংগ্রহ - ১, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৬
৩৪. ঐ, পৃ ১১৮
৩৫. ঐ, পৃ ১১৯
৩৬. সায়েদা বানু, বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতার স্বরূপ, ঢাকা, ২০০০ পৃ ২৪৭
৩৭. বশীর আল হেলাল (ভূমিকা লেখক), বাংলাদেশের ছোটগল্প, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী সংকলিত, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. পনের
৩৮. মোহাম্মদ আবু জাফর, বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর ছোটগল্প : বিষয়ের নিরিখে, দৈনিক সংবাদ, ২৫শে ২৫শে ফাল্গুন ১৩৮৯